***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 130-138*
*UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# ভারতচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'হীরা': একটি তুলনামূলক পাঠ

**ড.বিশ্বজিৎ মুখার্জী**
*বাংলা বিভাগ, গলসী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract***

*The character 'Hira' is a miraculous creation in Bengali Literature. Many a great authors got inspirations from the character Hiramalini as first created by Bharatchandra in Vidyasundar**.** But 'Hira' gets a new turn in the hand of Bankimchandra. After a comparative study of Bharatchandra and Bankimchandra, it seems that 'Hiradasi' in Bankimchandra's Bishabriksha is actually a modern representation of Bharatchandra's 'Hiramalini' in Hiradasi. The present study aims at exploring the reciprocal relation of these two 'Hira', their liveliness and how are they real in perspective of their age. The paper even highlights on different psychological aspects of two 'Hira'- a unique character full of virtues and vices, vengeance, envy and a real emblem of love. The present paper also tries to examine how luminous the character 'Hira' is- in the conscious creation of Bharatchandra and Bankimchandra differently, thus making the two authors eternal in Bengali Literature.*

***Keyword: Hira, Hiramalini, Vidyasundar, Bishabriksha, Sundar, Bharatchandra, Bankimchandra***

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বড়াই ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের ভাঁড়ু চরিত্রের পরিশীলিত রূপ- ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর হীরামালিনী। হীরার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন-

"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম ।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।।
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে।।
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।।
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।।"[১]

'সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ' অংশে মালিনী নিজের পরিচয় উত্থাপন করে বলেছে- সে দুঃখিনী, রাজবাড়ীতে নিয়মিত ফুল জোগানো তার কাজ। বলাবাহুল্য এই হীরামালিনী বাংলা সাহিত্যে অনেক ফুল জুগিয়েছে। আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'

উপন্যাসে হীরাদাসী তো ভারতচন্দ্রের হীরামালিনীর আধুনিক সংস্করণ বলে মনে হয়।সেখানে হীরার পরিচয় দানের সূত্রে ঔপন্যাসিক লিখেছেন –

> "এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা।
> তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্র গুণে সে দাসী মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।"[২]

আর হীরার দৈহিক বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্গিমচন্দ্রের ভাষ্যটি হল-

> "হীরা আবার সুন্দরী- উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্বাকৃতি;
> মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফনা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।"[৩]

গোবিন্দপুরে তার পরিচিতি সে নাকি বাল্যবিধবা। যদিও তার স্বামীর কোনো প্রসঙ্গ কেউ কখনও শোনে নাই। তবে হীরার বেশবিন্যাস ছিল সধবারই মতো। এ হেন হীরা আড়ালে বসে গান করে, দাসীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে নিজে সে তামাসা উপভোগ করে। কূটবুদ্ধিতেও তার দোসর মেলা ভার। সে-

> "পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া
> দেয়; কাহাকেও নিদ্রিত দেখিলে চুলকানি দিয়া সং সাজায়।"[৪]

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হীরা অত্যন্ত সজীব এবং বাস্তব চরিত্র। বঙ্কিম-উপন্যাসে বিতর্কিত নারী চরিত্রদের মধ্যে অন্যতম সে। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন-

> "হীরা চরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি; তাহার চরিত্রের প্রথম লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে ধনীর
> বিরুদ্ধে দরিদ্রের যে একটা গূঢ় অভিমান ও অকারণ বিদ্বেষ থাকে তাহাই। হীরা
> সূর্যমুখী অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে হীন মনে করে না। সুতরাং ভগবানের
> যে ব্যবস্থায় সে দাসী ও সূর্যমুখী প্রভুপত্নী, তাহার বিরুদ্ধে তাহার একটা চিরস্থায়ী
> অভিযোগ আছে।"[৫]

হীরা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সবচাইতে জটিল চরিত্র। কিন্তু ভারতচন্দ্রের হীরা হল 'নাতিনী ঘাতিনী বুড়ি।' বিদ্যার কাছে সে যথার্থই 'ফণির মণি'। যাকে ভারতচন্দ্র বলেছেন- 'যার কথায় হীরার ধার'।

'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের শুরু থেকেই হীরা পাঠক মনে জায়গা করে নেয়। তবে কবি তার আচরণ সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে জানিয়েছেন-

> "বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায় ।
> পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়।"[৬]

প্রথম দর্শনেই হীরা সুন্দরের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং সুন্দরের বক্তব্য থেকে হীরার চরিত্র সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট রেখাচিত্র পাওয়া যায়-

> "কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্টরীত।
> দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত।।"[৭]

অবশ্য বুদ্ধিমতী হীরার সুন্দরের চাতুর্য ধরতে বেশী সময় লাগেনি-

> "মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
> তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর।।"[৮]

তবে যথাসাধ্য আয়োজন দিয়ে মালিনী অতিথির সৎকার করে। এমনকী সুন্দরের দুরবস্থা সমাধানে সে তৎপর হয়। হীরার বাজার করার দৃশ্যটি পাঠককে চমৎকৃত করে। আসলে হীরার কথাবার্তা, রসালাপ প্রভৃতির প্রদর্শনে বোঝা যায় হীরা ভারতচন্দ্রের সচেতন কল্পনায় সৃষ্ট। সুন্দর প্রকৃত পরিচয় হীরার কাছে উত্থাপন করলে হীরা প্রথমে সন্ত্রস্ত হয়, কিন্তু বর্দ্ধমান রাজপরিবারের সমস্ত বৃত্তান্ত সে সুন্দরকে জানায়। বুদ্ধিমতী হীরা সহজেই বুঝতে পারে সুন্দরের এই আকর্ষণের হেতু বিদ্যা।

সুন্দরের কৌতূহল দেখে এবং তার মত নিয়ে হীরা স্বয়ং রাজা-রানির কাছে প্রস্তাব রাখার কথা বলে, হীরার এ হেন তৎপরতা প্রমান করে ঘটকালির বিষয়েও সে ছিল সিদ্ধহস্ত। যদিও তৎক্ষণাৎ সুন্দর সে প্রস্তাবে সহমত পোষণ করতে পারেনি। সুন্দরের কথামত হীরা রাজকন্যাকে সুন্দরের গাঁথা মালা উপহার দেয়। ক্রোধিত রাজকন্যার যাবতীয় কুকথা হীরা বিনয়ে সহ্য করে। তারপর কামমোহিত বিদ্যার অনুনয়ে সুন্দরের সেই দেহসৌষ্ঠব ও গুণপনার পরিচয় প্রদানে তো হীরা লাগামছাড়া-

"দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা
কহিছে কানের কাছে।
রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি তেমন আছে ।।
বদন মন্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষদ গোঁফের রেখা ।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমর পাঁতির দেখা ।।
গৃধিনী গঞ্জিত মুকুতা রঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে ।।
.....
আজানুলম্বিত বাহুসুবলিত
কামের কনক আশা।
রসের আলয় কপাট হৃদয়
ফণি মণি পরকাশা।।
যুবতীর মন সফরী জীবন
নাভি সরোবর তার ।
ত্রিবলির বন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর।।
দেখিয়ে সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হৈয়াছি বুড়া।"[৯]

আসলে হীরার এই কর্ম-তৎপরতা রাজান্তঃপুরের সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত করণে সহায়ক হলেও হীরা কিন্তু চেয়েছিল রাজপুরীর অন্ধকার দূর করতে, রাজকন্যার জীবনকে সদর্থক পথে পরিচালিত করতে। সুষ্ঠ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের রীতিতে বিদ্যা ও সুন্দরের চার হাত এক করতেই বদ্ধপরিকর ছিল সে-

"হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কানাকানি
শুভ কর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধার ঘরেতে কর আল।।"[১০]

কিন্তু হীরার কথায় রাজী হয়নি বিদ্যা।এমনকী বিদ্যার 'চুপে চুপে' বিবাহের প্রস্তাবকেও সে মেনে নিতে পারে নি। সে আতঙ্কে শিহরিত হয়েছে এবং জাতি,প্রাণ ও কলঙ্কের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েছে ।হীরার কথায়-

"দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে
ভাবি কিছু না পাই উপায়।
লোকে হবে জানাজানি আমা লয়ে টানাটানি
মজাইবে পরের বাছায়।"[১১]

কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় হীরার অজান্তেই শুরু হয় সুন্দরের সুড়ঙ্গ পথে রাত্রিকালীন অভিসার ও মিলন। অচিরেই বিদ্যা গর্ভবতী হয়। তারপর শেষ পর্যন্ত রাজার আদেশ মত কোটাল কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় বিদ্যার কক্ষ থেকে মালিনীর গৃহ পর্যন্ত সুরঙ্গ পথ। চোরের আশ্রয়দাত্রী রূপে নিগৃহীত হয় সে। ক্রোধিত হীরা, অপমানাহত হীরা সুন্দরের উদ্দেশ্যে তাই বলেছে-

"কি ছায় কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে দিলি বাসা লয়ে
কে জানে সিঁধেল চোর।।"[১২]

বিদ্যা ও সুন্দরের সুষ্ঠ পরিণতি প্রার্থিত ছিল হীরার। কিন্তু গুপ্ত প্রণয়কে সে সমর্থন করতে পারেনি। এমনকী সকলের অজ্ঞাতসারে বিদ্যার গর্ভধারণ প্রসঙ্গও তার জানা ছিল না। তাই আমাদের মনে হয় তার পরিনতি লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়েছে। আর রাজসভায় দাঁড়িয়ে তার প্রতিটি ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনাতেও ছিল না এক রত্তি মিথ্যে। হীরা সত্যি সত্যিই চেষ্টা করেছিল বিদ্যা ও সুন্দরের সম্পর্কের সুষ্ঠ সামাজিকীকরণ।

তবে কাহিনির শেষ লগ্নে হীরার আচরণটি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। সুন্দরের কাঞ্চীদেশে যাত্রাকালে যখন মালিনী মাসির কথা তার স্মরণে আসে তখন সে রাজাকে বলে-

"মালিনী মাসিরে মনে পড়িল তখন ।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন।।"[১৩]

অন্যদিকে হীরামালিনীও অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় জানিয়েছে বিদ্যা ও সুন্দরকে।কবির অসামান্য বর্ণনায়-

"কাঁদিতে লাগিল হীরা সুন্দরের মোহে ।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে।।"[১৪]

- হীরার এই অভিব্যক্তিতে নেই কোনো কপটতার আভাস। কাহিনির শুরু থেকে শেষাবধি হীরার এই দ্যুতি পাঠককে মোহিত করে ।বুদ্ধির চাতুর্য, ক্ষুরধার বাক্য প্রয়োগ, বাস্তব বোধের সুনিপুণ প্রকাশ সবমিলিয়ে পাঠক মনে ভারতচন্দ্রের হীরা বাংলা সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যের স্বর্ণশৃঙ্গে সমুজ্জ্বল।

সেই সুমহান ঐতিহ্যের পথ বেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে হীরা চরিত্রের প্রায় নব রূপ প্রাপ্তি ঘটেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে-

"ভারতচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন কোমল হীরা আর বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন কাঁচকাটা হীরা।"[১৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের হীরামালিনী উনিশ শতকীয় চিন্তা-চেতনা সম্ভূত। এখানে হীরা চতুর, পরশ্রীকাতর। স্বয়ং ঔপন্যাসিকের কথায়-

"হীরার অনেক দোষ।"[১৬]

হীরার কথাবার্তার ধরণ অন্য রকম। সূর্যমুখীর "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্"- কথার উত্তর দানের প্রসঙ্গে হীরা জানায়-

"না। আমি কখনও পাড়ার বাহির হই না।–আমি বৈষ্ণবী ভিখারীকে কিসে চিনিব?
ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না।"[১৭]

অথচ নূতন বারানসী শাড়ীর বিনিময়ে সূর্যমুখী যখন বৈষ্ণবীর সঙ্গে কুন্দের সম্পর্ক হীরার কাছে জানতে চায়, তখন হীরা পাঁচ হাত বুকে জানতে চেয়েছে-

"কখন জানিতে যেতে হবে?"[১৮]

কমলের কথার সূত্র ধরে সূর্যমুখী যখন বলে-

"জামাইবাবুকে মনে ধরে? বল তা হলে কমল সম্বন্ধ করে।"[১৯]

হীরার উত্তর-

"ভেবে দেখবো। কিন্তু আমার মনের মত একটা বর আছে।"[২০]

সঙ্গে সঙ্গে সূর্যমুখী সেই বরের হদিশ জানতে চাইলে হীরা বলেছে-

"যম"[২১]

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অদম্য ব্যক্তিত্ব- এই দুয়ের সহযোগে হীরা উপন্যাসে সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র। কার্যসিদ্ধির যাবতীয় কৌশল তার করতলগত। চারিত্রিক বৈপরিত্যে কুন্দ নন্দিনীর বিপ্রতীপে তার অবস্থান। যেখানে কুন্দ উপেক্ষিতা, সরল, কোমল ও অন্তর্মুখী সেখানে হীরা বিদ্রোহী। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় উল্লেখ করেছেন-

> "হীরা উপন্যাসের villain; গ্রন্থের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে যেখানে হৃদয়ের অসংযত, উদ্দাম প্রবৃত্তির জন্য অগ্নি জ্বলিয়াছে, সেইখানেই হীরা বাহির হইতে সেই অগ্নি বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে, অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। সে-ই সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের মধ্যে শেষ বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে; সে-ই মর্মপীড়িতা কুন্দনন্দিনীর নিকট আত্মহত্যার মন্ত্রনা ও অস্ত্র পৌঁছাইয়া দিয়া ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্যের জন্য আপনাকে দায়ী করিয়াছে।"[২২]

হীরা ভালোবাসে দেবেন্দ্রকে। কিন্তু দেবেন্দ্র চায় কুন্দকে আয়ত্ত করতে। তাই হীরা প্রেমিকের প্রিয়পাত্রীকে দূরে রাখতে সদা সচেষ্ট। যদিও-

> "হীরা-দেবেন্দ্রের কলঙ্ক-লাঞ্ছিত, ইন্দ্রিয় সুখ প্রধান প্রণয় কাহিনীটিও বঙ্কিম তাঁহার অত্যন্ত সংযম ও মিত ভাষিতার সহিত, কয়েকটি অর্থপূর্ণ আভাস ও সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতের দ্বারাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"[২৩]

উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্র ব্রান্ডির আবেশে প্রমত্ত হয়ে গান ধরেছে। সেই গানের কথাতেও এসেছে হীরামালিনীর নাম-'আমার নাম হীরামালিনী।/আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুজা আমার ননদিনী'। পরক্ষনেই দেবেন্দ্র দেখেছে খড়খড়ির আড়ালে পলায়নপর এক স্ত্রীলোককে। মদের ঝোঁকে তাকে চিনতে না পেরে গানের সুরে বলেছে-'তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি-কোথাও দেখেছি হে'। এই স্ত্রীলোকটি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছে 'আমি হীরা'। এই অংশে হীরার আচরণটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

হীরার পরিচয় জেনে মাতাল লাফিয়ে উঠে বলেছে-"Hurah! Three cheers for হীরা!" এবং তারপর সে হীরাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে গ্লাস হাতে স্তব করেছে-

> "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
> যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
> যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরা রূপেণ সংস্থিতা।।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
> যা দেবী পুকুর ঘাটেষু চুপড়ি হস্তেন সংস্থিতা।।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
> যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা।।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"[২৪]

হীরা জানতে চেয়েছে- কেন দত্তগৃহে বৈষ্ণবী-বেশে দেবেন্দ্র যাতায়াত করছে? অর্থাৎ হীরার এই দুঃসাহসিক সঙ্কল্প এবং উদ্যানে অলক্ষ্যে দেবেন্দ্র ও সুরেন্দ্রর কথোপকথন শুনে কামনা নিবৃত্তি করার সূত্রে-তার চরিত্রটি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। দেবেন্দ্রের গানেও ফুটে উঠেছে হীরার রূপের বৈভব-

> "বয়স তাহার বছর ষোল,
> দেখতে শুনতে কালো কালো,
> পিলে অগ্রমাসে ষোলো,
> আমি তখন খানায় পোড়ো।"[২৫]

হীরা সূর্যমুখীর কথা রেখেছে, সে খবর এনে দিয়েছে-দত্ত বাড়িতে দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জন্য বৈষ্ণবী সেজে যাতায়াত করে। তবে কুন্দ যে নির্দোষী সে খবর জানায়নি হীরা। আসলে হীরার মনস্তত্ত্বটিকে পাঠককে বোঝার ভার দিয়েছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। হীরার কথাতেই কুন্দকে দোষী সাব্যস্ত করেছে সূর্যমুখী। এবং তাকে কলঙ্কের দায়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছে। আসলে কুন্দনন্দিনীর এই অপমান তো হীরার-ই কারণে।

মালতী গোয়ালিনীর ডাকে হীরা পৌঁছে গেছে দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায়। যাত্রাকালে হীরার গানটি তাৎপর্যপূর্ণ-

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়,"[২৬]

দেবেন্দ্র বুঝেছে, হীরা বুদ্ধিমতী। এমনকী তার মতো দাসী পাওয়া মহেন্দ্রের সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করেছে দেবেন্দ্র। হীরাকে সে বহুল অর্থ পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে কুন্দকে বিক্রি করে দেবার আদেশ দিয়েছে। আসলে হীরা পুরস্কারের কাঙাল। কুন্দকে এনে দিলে কমল বলেছে তাকে হার দেবে। একথা শুনে হীরা আবার ভেবেছে-

"এখন কি করি?...এদিকে যদি কুন্দকে দত্তের বাড়ী ফিরিয়া লইয়া যাই,
তবে কমল হার দিবে,গৃহিণীও কিছু দিবেন-বাবুকেই কি ছাড়িব? আর
যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্র বাবুর হাতে দিই,তাহলে অনেক নগদ টাকা পাই।
কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব না।"[২৭]

পরক্ষণেই হীরা ভেবেছে, কুন্দকে দেবেন্দ্র কি এত সুন্দরী দেখেছে? আর ভেবেছে-

"আমরা গতর খাটিয়ে খাই; আমরা যদি ভাল খাই,ভাল পরি,পটের বিবির
মত ঘরে তোলা থাকি,তা হলে আমরাও অমন হতে পারি।"[২৮]

দেবেন্দ্রের প্রতি তাই ক্ষোভ উগরে দিয়ে সে অকপটেই বলতে পেরেছে-

"পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল!...আবার মিনসে
আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে!আর বলতে লোক পেলেন না!মারি মিনসের
নাকে এক কিল।"[২৯]

কুন্দের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে হীরা ভেবেছে- কুন্দ হল বোকা মেয়ে, আর সে নিজে সেয়ানা মেয়ে। তাই শেষ পর্যন্ত সাত পাঁচ ভেবেও মনে অনেক প্রত্যাশা রেখে সে স্থির করেছে-দেবেন্দ্রকে নয়, নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দিব।

ছলনা,চাতুরীতে হীরার জুড়ি মেলা ভার। সে ছলনা করেই, কথার কারিকুরি দিয়েই নগেন্দ্রর মন জয় করে মনস্কাম সিদ্ধ করেছে। সেই বলে দিয়েছে- সূর্যমুখীর কথাতেই কুন্দঠাকুরানী দেশত্যাগী হয়েছে।

উপন্যাসের চব্বিশতম পরিচ্ছেদে দেখি, দেবেন্দ্র হীরার ঘরে এসেছে, হীরা তক্তপোষের উপর শয্যা রচনা করে তাকে বসিয়েছে। এবং অন্যদিকে দেবেন্দ্রও দেখেছে-

"হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুত সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ নিবিড়-কৃষ্ণতার,
প্রদীপ্ত এবং বিলোলকটাক্ষ।"[৩০]

হীরার মুখে দেবেন্দ্র শুনেছে-দেবেন্দ্রকে হীরা মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করেছে। আবার পরক্ষণেই হীরার চৈতন্যোদয় হয়েছে, সে দেবেন্দ্রকে ঘর থেকে চলে যেতে বলেছে। সচকিত হয়ে সে জানিয়ে দিয়েছে- হীরা কুলটা নয়, সে দুঃখী এবং গতর খাটিয়ে পেট চালায়। পাশাপাশি সে রোষে উদ্দীপ্ত ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বলীয়ান হয়ে বলেছে-

"আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই-আপনাকে অতি অধম লোকে ভালবাসিলেও,
তাহার ভালবাসা লইয়া তামাসা করা ভাল নয়। ...আমার ধর্ম জ্ঞান নাই, ধর্মে
ভক্তি নাই-আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি
ভালবাসেন না-সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব?"[৩১]

-অর্থাৎ যেদিন দেবেন্দ্র ভালোবাসবে, সেদিন হীরা দেবেন্দ্রের দাসী হয়ে তার চরণসেবা করতে প্রস্তুত থাকবে।

হীরার শিক্ষা-দীক্ষা নেই, আছে নিজস্বতা। সে সতীত্বধর্মেও অটুট। দেবেন্দ্রের প্রতি তার অনুরাগ নিষ্ফল জেনে পুনরায় সে দাসীবৃত্তিতে ফিরে গেছে। তবে তার নারী প্রকৃতির তীব্রতা দিয়ে দাসী হয়েও সে 'প্রভু পত্নীর প্রভু' হয়ে উঠেছে। তবে হীরার পিছু ছাড়েনি দেবেন্দ্র। বুদ্ধিমতী হীরাও প্রতারিত হয়নি তার মধুর আলাপে। হীরা তাকে চোর বলে চিহ্নিত করে দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারিদের দ্বারা গুরুতর শাস্তি প্রদান করেছে। কোনো ক্রমে পালিয়ে রক্ষা পেয়ে দেবেন্দ্র মনস্থ করে হীরাকে এর প্রতিফল দেবে। উপন্যাসের ছত্রিশতম পরিচ্ছেদে দেখি, দেবেন্দ্রের সরস পরিহাসে হীরা বিগলিত। দেবেন্দ্রের সান্নিধ্য-তার মনে হয় স্বর্গসুখ। তারই অনুরোধে হীরা গান গেয়েছে। ঔপন্যাসিক বলেছেন, সে গান—প্রেমবাক্য,প্রেমভিক্ষায় পরিপূর্ণ। তবে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন-

> "দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়ে গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল।"[৩২]

তবে প্রতিশোধপরায়ণ হীরাও ছাড়বার পাত্রী নয়। সে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে বিষ কিনেছে এবং ভেবেছে-

> "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব?... যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নাহলে তাহার কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের একজনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।"[৩৩]

উপন্যাসের শেষ লগ্নে উন্মাদিনী বেশে হীরা আবার দেবেন্দ্রের সম্মুখে এসেছে। দেবেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে রোষদীপ্ত হীরা নিজের পরিণতির জন্য সরাসরি দেবেন্দ্রকে দায়ী করে বলেছে-

> "তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর- আমার এ দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। ...এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"[৩৪]

বুদ্ধির প্রখরতা ও ব্যক্তিত্বের শক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা অনবদ্য। দোষে-গুণে, ঈর্ষায়, প্রতিহিংসায় ও প্রেমে বাংলা সাহিত্যে সে অদ্বিতীয়।

আলোচনার উপসংহারে এসে বলতে পারি, হীরা চরিত্র ভারতচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয় স্রষ্টা দ্বয়েরই সচেতন কল্পনায় সৃষ্ট। তবে দুই হীরার মধ্যে তফাৎ সামান্য। ভারতচন্দ্রের হীরা হচ্ছে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়ে সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা নিজেই প্রণয়প্রার্থী। পাশাপাশি সে উনিশ শতকীয় জটিল চিন্তা-চেতনায় অভিষিক্ত ও বাস্তবরাগ রঞ্জিত। প্রসঙ্গত মনে পড়ে-

> "ভারতচন্দ্রের হীরা রাজসভায় শোভা পায়, হাসির ঝিলিক দিয়ে মাঝে মাঝে সবার চোখ ধাঁধায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা জীবন সমুদ্রের অমৃত মন্থনে আহৃত।"[৩৫]

সবশেষে বলতে পারি, বহুমূল্য 'হীরা'র মতোই বাংলা সাহিত্যে 'হীরা' আপন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্কর। আর এ হেন চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয় স্রষ্টাদ্বয়ও অবিনশ্বর।

**উল্লেখপঞ্জিঃ**

১) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পঞ্চম সংস্করণ,কলকাতা,বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ-১৪১৯, পৃ-২২০-২২১
২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), পুনঃপ্রকাশ, কলকাতা, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, নভেম্বর-২০১৫, পৃ-১৭৪
৩) তদেব
৪) তদেব

৫) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', সপ্তম সংস্করণ-পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭,পৃ-৬৭

৬) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', পৃ-২২১

৭) তদেব, পৃ-২২২

৮) তদেব

৯) তদেব, পৃ-২৪০-২৪১

১০) তদেব, পৃ-২৪৫

১১) তদেব, পৃ-২৪৬

১২) তদেব, পৃ-৩১৩

১৩) তদেব, পৃ-৩৫৬

১৪) তদেব

১৫)অনিমেষ ঘরামি, 'অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যুগগত প্রভাব', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, ২০০৯, পৃ-৮৪

১৬)বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র' (প্রথম খন্ড) পৃ-১৭৪

১৭) তদেব, পৃ-১৭৪-১৭৫

১৮) তদেব, পৃ-১৭৫

১৯) তদেব

২০) তদেব

২১) তদেব

২২) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃ-৬৬

২৩) তদেব

২৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র' (প্রথম খন্ড) পৃ-১৮১

২৫) তদেব

২৬) তদেব, পৃ-১৮৫

২৭) তদেব, পৃ-১৮৭

২৮) তদেব

২৯) তদেব

৩০) তদেব, পৃ-১৯৬

৩১) তদেব, পৃ-১৯৭

৩২) তদেব, পৃ-২২৯

৩৩) তদেব, পৃ-২৩০

৩৪) তদেব, পৃ-২৪৮

৩৫) অনিমেষ ঘরামি, 'অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যুগগত প্রভাব',পৃ-৮৪

**সহায়ক গ্রন্থঃ**

১) অনিমেষ ঘরামি। 'অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যুগগত প্রভাব'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, ২০০৯।

২) আশুতোষ ভট্টাচার্য। 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস'। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, এ মুখার্জ্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫।

৩) জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'রবি প্রদক্ষিণ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

৪) ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, সাহিত্য সঙ্গী, ২০০৭।

৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র'(প্রথম খন্ড)। পুনঃপ্রকাশ। কলকাতা, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০১৫।

৬) বিজনকান্তি নন্দী। 'রাজসভার ত্রয়ী ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দীপন, ২০০৮।

৭) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৯।

৮) সুকুমার সেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তৃতীয় খন্ড)। প্রথম প্রকাশ, নবম মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ, ১৪১৮।

৯) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। সপ্তম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭।